অনুবাদ: দেবগুরু চ্যাটার্জি

ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে দলিত ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে যে লড়াই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রবলভাবে চলছে তার এক প্রধান সেনানী, কাঞ্চা ইলাইয়া শেফার্ড। এক মেষপালক পরিবারে জন্মানো কাঞ্চা ইলাইয়া শৈশব থেকে অনুভব করেছেন, কি ভয়ঙ্কর নিপীড়ন, বঞ্চনা আর অবমাননা 'স্বাধীন-ভারত', 'গণতান্ত্রিক-ভারত' নিয়মিত বরাদ্দ রেখেছে দেশের এই ৩০ শতাংশ জনসমষ্টির জন্য। প্রতিবিধানে যত্নবান হয়েছেন যৌবনে। এখন তিনি হায়দরাবাদের মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটির সেন্টার টু দ্য স্টাডি অফ সোশ্যাল এক্সক্লুশন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ পলিসির ডিরেক্টর। লিখে চলেছেন একের পর এক বই, প্রবন্ধ দলিতের অধিকার আদায়ে, দলিতের সনাতন দুরবস্থার আধুনিক সমাধান সন্ধানে। সাম্প্রতিক লেখাটি– গত ১৩ই মে, রোববারের মেইনস্ট্রিম উইকলিতে ছাপা প্রবন্ধ "What Is My Philosophy"-র ভাবানুবাদ করলাম এখানে।

আমার দর্শনটা কি?

==============

'আমি কেন হিন্দু নই' ও 'হিন্দু-উত্তর ভারতবর্ষ' বইদুটি লেখার পরে তেলেগু রাজ্যগুলির ব্রাহ্মণ-বেনিয়ারা (যে সামাজিক শ্রেণীদুটি হিন্দুদের আধ্যাত্মিক দুনিয়া ও গোটা ভারতের বানিজ্যক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে) আমায় প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আমার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করে। অপরিমিত সম্পদশালী ও অত্যন্ত শিক্ষিত ওই দুটি জনগোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবিরা আমায় প্রশ্ন করে: তোমার দর্শনটা কি? এসব বই কেন লিখছ তুমি? প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। আম্বেদকরের পরে যেহেতু আমিই তাদের ধর্মবিশ্বাসকে সবচেয়ে কঠোরভাবে আক্রমণ করছি, তাদের অধিকার বর্তায় এধরণের প্রশ্ন করার; ধর্মবিশ্বাস দর্শনের আয়ত্তাধীন ক্ষেত্র। আমার নিজস্ব কোনো আধ্যাত্মিক দর্শন না থাকলে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ও ধর্মবিশ্বাসকে সংকটে ফেলার অধিকারও আমার থাকে না।

এই প্রশ্নটা – আমার দর্শনটা ঠিক কি? – আমায় দীর্ঘকাল তাড়িত করেছে। আমি কি ভারতীয় দর্শন মেনে চলি, না বিশ্বদর্শন মেনে? নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলার জন্য মনে মনে তোলপাড় চালাতে চালাতে আচমকা আমার মনে এভাবনাটা উদয় হল যে দর্শন কখনো আঞ্চলিক, স্থানিক বা নির্দিষ্ট ভূগোলে আবদ্ধ হতে পারে না। যেহেতু আমি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ তাই আমিও আর পাঁচটা মানুষের মত এক সামগ্রিক দর্শন নিয়ে এ পৃথিবীতে বাস করি। একজন মানুষ হিসাবে – শুধু পুরুষ বা নারী হিসাবে নয় – আমি নিশ্বাস নি, জলপান করি, নিজের বা অপরের শ্রমের অন্ন গ্রহণ করি – শৈশব ও অতিবার্ধক্যে অপরের শ্রমনির্ভর – আমি ঘুমাই, চলি, কাপড় পরি এ পৃথিবীর অন্য যে কোনো মানুষের মতই।

পৃথিবীর আর সকলের মত ভারতীয়রাও একদা বনবাসী ছিল, অন্যান্যদের মতই তারা জঙ্গল সাফ করে চাষাবাস করেছে। গোরুমোষ দিয়ে জমি চাষ করেছে, তাদের পোষ মানিয়েছে। এসব অবশ্যই হরপ্পাযুগেরও আগের কথা। যাইহোক, হরপ্পাবাসীরাই পৃথিবীতে প্রথম নগর পত্তন করে, নিজেদের নামে তার নামকরণ করে। হরপ্পাযুগে মানবসভ্যতা এক উন্নততর স্তর স্পর্শ করেছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মত হরপ্পাবাসীরাও নদীতীরে সভ্যতা গড়ে তোলে। তারা অন্য দেশ পরিভ্রমণ করেছে ও অন্যদেশের পরিব্রাজকদের তাদের অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও মানবশ্রমই ছিল গোটা পরিকাঠামোর চাবিকাঠি। মেসোপটেমিয়ার মত প্রাচীনতম সভ্যতাগুলিতে প্রচলিত ছিল এমন ব্যক্তিনাম উদ্ধার করা যায় নি, কিন্তু ভারতীয় হরপ্পাবাসীদের – যারা শুরুর দিকে নগরসভ্যতা পত্তন করে – তাদের কারো কারো নাম জানা সম্ভব হয়েছে। বীরাপ্পা, ভীরাপ্পা, মারাপ্পা নামগুলি দক্ষিণভারতে পশুপালক তথা সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ধারক-চালকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। সুতরাং শ্রমই জীবন, কৃষিই সব নির্মানের ভিত্তি – এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে, মাঠঘাটের শিক্ষাকে ভিত্তি করে আমার দর্শন গড়ে উঠেছে।

আমার দর্শন হল কোনো কিছুকে যাচাই করে দেখা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, ভুলের থেকে শিক্ষা নেওয়া। এটা একটা সার্বজনীন বিষয়, কোনো জাতির কুক্ষিগত নয়। যেটা এখানে করা গেছে সেটা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় করা সম্ভব। আমি জন্মেছি – পাপাইয়া পেট, ওয়ারাঙ্গাল জেলা, তেলেঙ্গানাতে – এটা নেহাতই আপতিক। দৈবাৎ আমি ভারতের হায়দরাবাদে থাকি – নির্দিষ্ট গাত্রবর্ণ নিয়ে, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক শ্রেণী চিহ্নিত হয়ে। কিন্তু যদি আমি জাপানে, জার্মানীতে বা ইসরায়েলে জন্মাতাম তবে ওখানে যারা বাস করেছে বা যারা এখন বাস করছে তাদেরই একজন হয়ে জন্মাতাম। সুতরাং দর্শনগতভাবে দেখলে আমি শুধুই মানুষ একজন।

প্রত্যেক মানুষই আসলে বিশ্বমানব। নিজের এই বিশ্বজনীন অস্তিত্ব জানার ফলে আমি বিশ্বের অন্য সব মানুষের সাথে আমার মিল খুঁজে পাই, নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে খুঁজে পাই – যে এই মহাবিশ্বের এক অংশ। এই ভাবনা আমাকে জানায় আমার বিশ্বজনীনতা আমার নির্ধারিত অস্তিত্বটির তুলনায় ব্যাপকতর। শৈশবে আমি মেষপালক ছিলাম, বড় হয়ে হই বিদ্যার্থী, পরবর্তীকালে আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; এখন আমি ব্রাহ্মন্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এক কর্মী যার লক্ষ্য কৃষক, পশুপালক, কুমোর, মুচি ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীর দুর্দশা মোচন।

কিছু দুর্বলচিত্ত মাথামোটা ভারতীয়, একটা সময় জুড়ে, ব্রাহ্মণ – এই অপ্রমাণিত ধারণাটি গঠন করে। ব্রাহ্মণ ধারণাটি মানবতা বিরোধী। এই অপরীক্ষিত ধারণাটি প্রাচীনকালে একটি অপরিণত ভাষা – সংস্কৃতের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণত্বের ধারণাটি জনান্তরালে বসবাস, প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন থাকা ও নৈস্কর্মভিত্তিক জীবনযাপনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সারা পৃথিবীজুড়ে ব্যবহৃত হয় যে ভাষা, ইংরাজি, তার ক্রমপ্রসার ভারতেও হচ্ছে, এর সাথেসাথে বিশ্বমানবের ধারণাটিও আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে; ভারতীয় কোনো ভাষা এই ধারণা দেয়ার মত উন্নত নয়, ভাষাগুলির উন্নতি ব্যাহত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদ নির্ভর জনবিচ্ছিন্ন কতিপয় ক্ষুদ্রমনা চিন্তকের হাতে পড়ে।

মানবের (এই বিশ্বজনীন) ধারনাটিকে অস্বীকার করায় ভারতীয় দার্শনিকের মৃত্যু ঘটে ব্রাহ্মণের হাতে। চাষিবাসি মানুষ সমাজে মূল্যহীন বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ব্রাহ্মণেরা গরুকে মানুষের চেয়েও উঁচুদরের প্রাণীর মর্যাদা দেয়। ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসীরা উৎপাদনকে প্রকৃতিদূষণসম বলে মনে করে। পশুকে মানুষের চেয়ে বড় বলে মনে করার ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে বিশেষরকম অবমাননাকর। ব্রাহ্মণেরাই পশুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করার রীতি উদ্ভাবন করেছে। কোনো কিছু গঠন করার বদলে ধ্বংস করাই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক চরিত্র। কুমোর, ইঁটভাটার শ্রমিক, মুচি, মেষপালক, ছুতোর, লোকবাদক – সক্কলকে ব্রাহ্মণেরা অচ্ছুৎ করে রেখেছে। এই পরিস্থিতির বদল তখনই আসবে যখন ব্রাহ্মণদের বাধ্য করা যাবে ইঁটভাটায় কাজ করতে, ঘরামির কাজ করতে, রাখাল বাগালের কাজ করতে – পরিণামে ব্রাহ্মণরা মানুষ হয়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত ওরা মানুষ নয়। ওরা মানবেতর।

যখন আমার চোখের সামনে ২০১৪ সালে ব্রাহ্মণেরা দিল্লীর ক্ষমতাশীর্ষে অধিষ্টিত হল, তারা গরু দেবতাতুল্য এবং তার অপমান ব্রাহ্মণের অপমান – এই আদিম অপরিণত ব্রাহ্মণ্যবোধ থেকে মানুষ খুন করা শুরু করল। ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসীরা এটা বিশ্বাস করেনা যে মানুষই সর্বোত্তম জীব। তাদের ব্রাহ্মণত্বের ধারণাটি নেহাতই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। ওরা দেবতা ও জাতীয়তাকে এমনভাবে জড়িয়ে পাকিয়ে ফেলেছে যে ওদের দেবত্বের ধারণা কখনই বিশ্বজনীনতায় উন্নত হতে পারবে না।

ব্রাহ্মণত্বের সমর্থকেরা তাদের পারিপার্শ্বিক মানুষদের নানাভাগে বিভাজিত করে রেখে দিয়েছে এবং অনুন্নত ভাষা ও চিন্তনপদ্ধতিতে বেঁধে রেখেছে যাতে বর্ণব্যবস্থা টিঁকে থাকে। ঈশ্বর ধারণাটির বিশালত্বকে তারা আয়ত্ত করতে পারেনি। ঈশ্বর ধারণা যেহেতু বিশ্বজনীন তাই তারা এর ক্ষমতা বুঝতে সক্ষম হয়নি। ব্রাহ্মণত্বকে ঈশ্বরস্বরূপ ভেবেই তারা এতকাল কাটিয়ে দিয়েছে, যা আসলে একটি গতানুগতিক দর্শনরিক্ত ধারণা।

যে কোনো দার্শনিক ধারণাই বিশ্বজনীন। কোনো ধারণা বিশ্বস্বীকৃত না হলে তার কোনো দার্শনিক স্বীকৃতিও থাকেনা। ব্রাহ্মণ একটি বর্বর ধারণা। সব মানুষকেই সমান করে তৈরী করা হয়েছে এ ধারণায় তারা বিশ্বাস করেনা। তাদের অনৈশ্বরিক বিশ্বাসমতে কেউ জন্মেছে মাথা থেকে, কেউ কাঁধ থেকে, কেউ থাই থেকে, আর অনেকে পা থেকে। আমার সময়ে দলিতদের দেখা হয় এমন মানুষ হিসাবে যারা ব্রাহ্মণের সৃষ্টিতত্ত্বের বাইরে পয়দা হয়েছে। এর মানে, নিশ্চই তারা বিশ্বের আর সব মানুষের মত কোনো সার্বজনীন ঈশ্বরদ্বারা তাদের সমান করে সৃষ্ট। তারা মুক্তির অপেক্ষায় সেই সার্বজনীন ঈশ্বরের পানে তাকিয়ে রয়েছে। এই পৃথিবীতে দাস যারা, কালো যারা, নারীসমাজ – ওই বিশ্ববিধাতার কৃপায় মুক্তি লাভ করেছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণরা ৩০ কোটি মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, আর বাকি ৬০ কোটি মানুষকে উঁচু নিচু বর্ণে বিভাজিত করেছে। এ এক দার্শনিকভাবে অচল সৃষ্টিতত্ত্ব।

বিশ্ববিধাতা বিশ্বের সব মানুষকে একভাবে তৈরী করেছে; বা, যদি তারা বিবর্তিত হয়ে থাকে, তবে বিবর্তন একইভাবে ঘটেছে – বাঁদর থেকে শিম্পাঞ্জি থেকে দলিত, বা বাঁদর থেকে শিম্পাঞ্জি থেকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ। তারা পৃথিবীর বাকি অঞ্চলে একরকমভাবে – সমান হিসাবে – আর শুধু ভারতে বর্ণবিভাজিত হয়ে জন্মাতে পারেনা। যে বইয়ে ব্রাহ্মণদের এই কুপ্রস্তাবনা লিখিত হয়েছে তা শয়তানের কেতাব।

যে কোনো ঐশ্বরিক ধারণা সমন্বয়ের কথা বলে কিন্তু ভারতভুমে জন্ম নেয়া ব্রাহ্মণত্বের ধারণা আদ্যন্ত বিভেদকামী। ওরা অনুসরণকারীদের বোধ অনুন্নত করে রাখে, আর ওই অনুন্নত বোধের লোকগুলো নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ করে এই দেশের মানুষের চেতনাকে বিশ্বচেতনার স্তরে উন্নীত হতে বাধা দেয়। মানসিকভাবে তারা পশু আরাধনার স্তরে

আটকে থাকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ব্রাহ্মণ পশুদেহে বাস করে। যেহেতু ব্রাহ্মণত্বে বিশ্বাসীরা দর্শনগত ও ভাষাগতভাবে অনুন্নত তাই বিশ্ববিধাতারা, মসীহারা যে বিশ্বজনীন ভাষা নির্মান করেছে ঈশ্বরের শক্তিকে অনুভব করতে চেয়ে, তা এদের বদ্ধমানসে প্রবেশ করতে পারেনা।

যখন আমার প্রজন্ম বিশ্বজনীন ভাষা ইংরাজিকে আয়ত্ত করেছে এবং বিশ্বদর্শনের গভীরতায় অবগাহন করেছে ব্রাহ্মণত্বের এঁদোপুকুরে ডুব না দিয়ে, তখন মানবের উন্নতিকল্পে আমাকে সার্বজনীন ঈশ্বর ও বিশ্বমানবের ধারণার কথা প্রচার করতে হবে, সেইমত জীবনযাপন করতে হবে। ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারনা মানবোত্তর। এর সাথে জড়িত রয়েছে বিশ্বসৃষ্টি বা বিশ্ববিবর্তন – স্থল, জল, জীবন, বৃক্ষ, পশু, মানুষ এবং অন্যান্য সবকিছু। কিন্তু সৃষ্টি বা বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল হল মানুষ। এমন যে মানুষ সে কখনোই পশুর অধীনস্থ হতে পারেনা। এই হতমানকর দশা ব্রাহ্মণের দান। ব্রাহ্মণ বিশ্বপ্রকৃতির কিছুই বুঝতে পারেনি, পাথর বা পশুকে পূজ্য বিবেচনা করে বলে বা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে যোগধ্যান করে বলেই সে আজও বিশ্বজ্ঞান প্রাপ্ত হল না। ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণের শরীর বা মন কোনটাই বিশ্বের সামগ্রিক হালচাল গ্রহণ করতেও সমর্থ হল না।

প্রকৃতির শক্তিকে অনুভব করতে হলে মানুষকে কায়িক পরিশ্রম করতে হয় – ব্রাহ্মণ যেটাকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখে।

এদিক থেকে ব্রাহ্মণ পশুতুল্য। সে এখনো মানুষের উচ্চতা প্রাপ্ত হয়নি। কোনো মানুষের পক্ষে পশুকে দেবতাজ্ঞান করা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের অপরিণত আধ্যাত্মিক গঠন (যদিও সে একে আত্মা বলে) তাকে এক অনুৎপাদনশীল অস্তিত্বে পরিণত করেছে, অথচ তার শরীর-স্বাস্থ্য অন্য পাঁচজন মানুষের মতই। যদিও ব্রাহ্মণের শরীর অনুৎপাদনশীল তথাচ সে অন্য যে কোনো মানবদেহের মতই উৎপন্নদ্রব্য ভোগ করে।

যারা ব্রাহ্মণ ধারণাটির দ্বারা চালিত হয়ে বহুযুগ এদেশে বসবাস করেছে তারা কেউ মানুষে বিবর্তিত হতে পারেনি। এখন ভারতীয় মানবকে বিশ্ববিধাতার আধ্যাত্মিক ধারণার সাথে একীভূত হতে হবে। জাতির ধারণা বিশ্বধারণার একটা অংশ মাত্র।

N.B. অনুবাদক কাঞ্চা ইলাইয়া শেফার্ডের মূল সুরটির সাথে সমমর্মীতা পোষণ করলেও তার সব বক্তব্যের সাথে, বা তার দেয়া সমাধানের সাথে সহমত নয়। ভিন্নমতটা এখানে যোগ করলে প্রবন্ধটিকে লঘু করা হয়ে যাবে। যারা এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ অবধি পড়লেন, তাদের থেকে যুক্তিপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা কাম্য।